



আনু মুহাম্মদ

বাণিজ্যের ফাঁদে পাবলিক বা সর্বজনের শিক্ষা

মুনাফা বা টাকার
উন্মাদনা সমাজের
সুবিধাভোগী অন্যান্য
অংশের মতো শিক্ষা
প্রতিষ্ঠানেও ব্যাপক
আকার ধারণ করেছে,
টাকা কামানোর সর্বরকম
তৎপরতা দিনে দিনে
অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠছে।
শিক্ষকদের বাণিজ্যিক
প্রবণতা থেকে
টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি,
নিয়োগ বাণিজ্য,
পরীক্ষার প্রশ্নফাঁস পর্যন্ত
এটি বিস্তৃত

বেতন/ফি সহ প্রতিষ্ঠানকে দেয় ব্যয় যা হয় তা শিক্ষা গ্রহণের জন্য মোট ব্যয়ের প্রধান অংশ নয়। অর্থাৎ শিক্ষা গ্রহণ করতে গেলে যে ব্যয়গুলো হয় তার মধ্যে প্রধান অংশ হলো প্রতিষ্ঠানকে দেয় ব্যয়ের বাইরে যে ব্যয় হয় সেটি। এর মধ্যে আছে খাতা-বই ক্রয়, টিউশনি বাবদ ব্যয়, বাড়ি দূরে হলে থাকা-খাওয়ার ব্যয়, যাতায়াত, কোচিং ইত্যাদি।

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এই যে, প্রতিষ্ঠান-বহির্ভূত ব্যয় বৃদ্ধি প্রতিষ্ঠানকে দেয় ব্যয় বৃদ্ধির তুলনায় অনেক দ্রুত হারে বাড়ছে। গত এক দশকে এই বৃদ্ধির হার অনেক বেশি। প্রতিষ্ঠান-বহির্ভূত এই শিক্ষা ব্যয় বৃদ্ধি আরো ব্যাপকতা পেয়েছে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের ভেতরে অনানুষ্ঠানিকভাবে, আন্তঃ-ধীরে, গোপনে-প্রকাশ্যে ব্যক্তিমালিকানাধীন ও বাণিজ্যিকীকরণ ঘটে যাওয়ার মধ্য দিয়ে। অন্যদিকে, শিক্ষাখাতে রাষ্ট্রের আনুপাতিক ব্যয় গত প্রায় তিন দশকে কমেছে। তাছাড়া সরকারের বায়ুবৃদ্ধির ধরনও পরিবর্তিত হয়েছে।

শিক্ষা ক্ষেত্রে রাষ্ট্র কতটা দায় নিচ্ছে সেটা নিছক বাজেট থেকে বা টাকা পয়সা থেকে বোঝা যায় না। এটা একটা নীতিগত প্রশ্ন। এবং নীতিগত অবস্থান থেকে শুধু অর্থের পরিমাণগত বরাদ্দই নির্ধারিত হয় না, নির্ধারিত হয় তার গুণগত রূপ, অগ্রাধিকার এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনাও।

স্কুল কলেজের পাশাপাশি ৯০ দশকের শুরু থেকে ব্যক্তি বা গোষ্ঠী মালিকানাধীন বেসরকারি বা বাণিজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু। মালিকেরা

বা দেশে বাড়তি কাজ করে সন্তানকে পড়াছন্ন যাতে সন্তানের অবস্থা বদলায়, তাদের মতো না থাকে। চিকিৎসা ক্ষেত্রেও এই অবস্থা। শিক্ষা ও চিকিৎসার এই বাণিজ্যিকীকরণের কারণে সাধারণভাবে শিক্ষা ও চিকিৎসাখাতে মানুষের ব্যক্তিগত/পারিবারিক ব্যয় বেড়ে গেছে অনেক। শিক্ষা ও চিকিৎসা সর্বজনের জন্য অধিকার হলেও এসব ক্ষেত্রে সরকারের দায়দায়িত্ব কমানোর নীতিগত অবস্থানের কারণেই এসব প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণ করা হয়নি।

বাংলাদেশের এই গতিমুখ লাভের ঘটনাটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঘটেনি। 'সংস্কার' 'উন্নয়ন' নামের নানামুখী কর্মসূচি বাস্তবায়নের সচেতন সংগঠিত উদ্যোগের ফল হিসেবে বাংলাদেশের এই গতিমুখ নির্ধারিত হয়েছে, বর্তমান চেহারা তৈরি হয়েছে। এগুলো সবই হয়েছে দেশ-বিদেশের বহু অর্থ ব্যয়ে, বহু বিশেষজ্ঞ পরামর্শ নিয়ে। বিশ্বব্যাংকের দেড় হাজার কোটি টাকার পাটখাত উন্নয়ন কর্মসূচি দিয়ে বন্ধ করা হয়েছে আদমজী পাটকল। শিক্ষাখাতেও এরকম অনেক কর্মসূচি চলছে কয়েকহাজার কোটি টাকার, বিশ্বব্যাংক আছে, আছে এডিবি। বড় কারখানা বন্ধ হয়েছে, বড় বিশ্ববিদ্যালয়ও এখন বাহুল্য বিবেচনা করা হচ্ছে।

এই সংস্কার কর্মসূচির ফল হিসেবে অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত্ব খাতের মতো রাষ্ট্র পরিচালিত শিক্ষাখাতেরও আপেক্ষিক সংকোচন ঘটছে। শিক্ষাখাতও একটি বাজার-মুনাফা-ব্যক্তিকেন্দ্রিক খাত হিসেবে গড়ে উঠেছে। সর্বজন বা পাবলিক শিক্ষাখাত অনেক ক্ষেত্রে হয়ে উঠেছে একটা মরা খোলস, যার ভেতরে চলছে জাঁকজমকপূর্ণ

প্রতিষ্ঠিত হওয়া, পরিকল্পিতভাবে সর্বজন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও হাসপাতালের পশু অবস্থার সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্যিক খাত হিসেবে শিক্ষা ও চিকিৎসার বিস্তার ইত্যাদি বর্তমান উন্নয়ন দর্শন ও রাজনীতিরই অবদান।

এগুলো তাই এমনি এমনি, কিছ দখলদারের দাপট থেকেই ঘটেনি। রাষ্ট্রীয় নীতিই তাই। সরকার বদলে তাই এসব নীতির পরিবর্তন হয় নাই। প্রান্তস্থ দেশগুলোতে এই নীতির প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ ও সহযোগী নানা সংস্থা সদা সক্রিয়। বিভিন্ন খাতে উন্নয়নের নামে প্রণীত তাদের নীতির লক্ষ্যই তাই। আগেই বলেছি, দেশে শিক্ষাখাত বরাবর কার্যত বিভিন্ন খু খু নির্দেশনার মাধ্যমে পরিচালিত হয়েছে। এই খু খু নির্দেশনা এসেছে অল্প নীতির মধ্য থেকে। মাধ্যমিক শিক্ষায় এডিবির প্রকল্প তার একটি উদাহরণ। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে এরকম একটি ছাতা-কর্মসূচি হচ্ছে বিশ্বব্যাংক সমর্থিত ২০ বছরব্যাপী কৌশলপত্র। সরকারের বিভিন্ন শিক্ষানীতি, সর্বশেষ ২০১০ সালে প্রণীত, এই ধারাবাহিকতা খর্ব করেনি। এই কৌশলপত্রের মূল মনোযোগ হচ্ছে সর্বজন বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান কাঠামো পরিবর্তন করে তাকে বাজার অনুকূল করা, শিক্ষার্থীদের আবাসিক ব্যবস্থা ক্রমে সংকুচিত করা, বেতন ফি ইত্যাদি ধীরে ধীরে এমনভাবে বৃদ্ধি করা যাতে এসব প্রতিষ্ঠানের খরচের বড় অংশ শিক্ষার্থীদের থেকেই গ্রহণ করা যায়। অর্থাৎ ক্রমে ক্রমে সর্বজন বিশ্ববিদ্যালয় যেন বাণিজ্যিক মুনাফা সন্ধানী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাগোষ্ঠী হয় সেই পথ প্রশস্ত করা।



পাবলিক বা সর্বজনের বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ বাণিজ্য নিয়ে টিআইবি যে রিপোর্ট দিয়েছে, তা ইঙ্গিত দেয় সর্বজনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অর্থকেন্দ্রিক নৈরাজ্যের। অধীকারের সংস্কৃতিচর্চার বদলে প্রয়োজন সত্য অনুসন্ধান ও সর্বজনের সজাগ ভূমিকা। এই অবস্থা সমগ্র সমাজের গতিপ্রকৃতির প্রতিফলন। কিন্তু সর্বজন বিশ্ববিদ্যালয়কেটা যখন গ্রাস করতে সক্ষম হয় তখন তা মহাবিপদ সংকেত দেয়।

আপাত দৃষ্টিতে নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা দেখা গেলেও মনোযোগ দিলে বাংলাদেশের সমাজ অর্থনীতির মতো শিক্ষাখাতেও আমরা পাই শৃঙ্খলা ও ধারাবাহিকতা। এই শৃঙ্খলা ও ধারাবাহিকতার মধ্যে আমরা পাই একটি বিশেষ ধরন। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য দিকগুলো হলো: (১) সকল পর্যায়ে শিক্ষা অর্জনের জন্য ব্যয়ের ক্রমান্বয় বৃদ্ধি। (২) সরকারি ও সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত কম ব্যয়বহুল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অবকাঠামোগত দুরবস্থা বৃদ্ধি। (৩) বহু প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের বেতন নিয়ে নৈরাজ্য। (৪) বহু প্রতিষ্ঠানে অশিক্ষক ক্ষমতাবানদের হস্তক্ষেপ বৃদ্ধি। (৫) শিক্ষকতা পেশায় নিয়োগে কমিশন বাণিজ্য বিস্তার। (৬) কম্পিউটারের সংখ্যা বাড়লেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গ্রন্থাগার ও গবেষণাগারের ক্রমান্বয়ে প্রান্তিক অবস্থা প্রাপ্তি। (৭) প্রায় সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভেতরে ও আশেপাশে কোচিং ও টিউশনির প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ। (৮) সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মশিক্ষার গুরুত্ব বৃদ্ধি। (৯) স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, মাদ্রাসা সকল ক্ষেত্রেই ইংরেজি মাধ্যম উচ্চ ব্যয়বহুল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি। (১০) প্রশ্নপত্র ফাঁস, গাইডবই, কোচিং সেন্টার, শিক্ষক নিয়োগ ইত্যাদি বাণিজ্যিক তৎপরতার আধিপত্য বৃদ্ধি।

শিক্ষাখাতে ব্যয় নিছক প্রতিষ্ঠানের বেতন বা ফি দিয়ে বোঝা যাবে না। এই ব্যয়ের অনেকগুলো দিক আছে। এরমধ্যে একটি অংশ হলো প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয় বা প্রতিষ্ঠানকে দেয় শিক্ষার্থীদের ব্যয়। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে এগুলোর মধ্যে আছে বেতন, ফি, এক্সট্রাশনিমেন্ট চার্জ, ভাইনিং চার্জ, পুনঃভর্তি ফি, নম্বরপত্র ফি, পরিবহন ফি, সংসদ চাঁদা ইত্যাদি। রাষ্ট্রীয় কলেজ স্কুল পর্যায়েও

এসব প্রতিষ্ঠানকে অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে দাবি করলেও মুনাফা এসব প্রতিষ্ঠানের চালিকা শক্তি। সেজন্য এসব বাণিজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয়ে বেতন ফি অনেক বেশি। চাহিদা ও মুনাফাযোগ্যতা উৎসাহব্যাঞ্জক হবার কারণে এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সংখ্যা পরবর্তী বছরগুলোতে বেড়েছে দ্রুত। শিক্ষা যে এতো লাভজনক বিনিয়োগ ক্ষেত্র হতে পারে তা আগে অনুধাবন না করলেও পরে এই মুনাফার টানে শিক্ষার সকল পর্যায়ে এধরনের বাণিজ্যিক উদ্যোগ বাড়তে থাকে। স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত।

বেতন ফি এসব প্রতিষ্ঠানে অনেক বেশি। তার মানে এটা নয় যে, এখানে যে শিক্ষার্থীরা পড়ে তারা সবাই সচ্ছল বা বিস্তারিত পরিবারের সন্তান। বরং অধিকাংশই মধ্যবিত্ত নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে আগত। প্রাথমিক স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত পাবলিক বা সর্বজন প্রতিষ্ঠানে স্থান সংকুলানের অভাবসহ নানা কারণে এসব প্রতিষ্ঠানেই ভর্তি হচ্ছে সমাজের বড় অংশ। সীমিত বা নিম্ন আয়ের মানুষেরা ধারণনা করে, জমি বিক্রি করে, অনেক ঝুঁকি নিয়ে প্রবাসে কাজ খুঁজে

বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপনায় শিক্ষা। সরকারি স্কুল ও কলেজে কোচিং, নোট বই, প্রাইভেট টিউশনি ইত্যাদি এর অংশ। বিশ্ববিদ্যালয়ে বাণিজ্যিক নানা উদ্যোগ আপাত শিক্ষা সম্প্রসারণের চেহারাতেই ঘটছে। এবং এগুলোর প্রধান আকর্ষণ বাজার অনুকূল বিষয় প্রশিক্ষণ।

গত কয়েক দশকে সরকার-নির্বিশেষে যে উন্নয়ন দর্শন বাংলাদেশে আধিপত্য বিস্তার করেছে তারই সাক্ষাৎ ফলাফল এই ধারার সম্প্রসারণ। এই উন্নয়ন দর্শনের সারকথা হলো সর্বজন প্রতিষ্ঠান, সর্বজন সম্পত্তি দ্রুত ব্যক্তি মালিকানাধীন সম্পত্তি ও বাণিজ্যিক মুনাফাকেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা। এই দর্শন এটাই নিশ্চিত করতে চায় যে, সর্বজনের সম্পদে সর্বজনের অধিকার থাকবে না, তাদের কাজে লাগবে না, সেগুলো ব্যবহৃত হবে কতিপয় ব্যক্তির মুনাফার পাহাড় তৈরিতে। সর্বজন সম্পত্তি যেমন নদীনালা খাল বিল জলাশয় খোলা মাঠ ব্যক্তির দখলে যাওয়া, বনজঙ্গল, তেল গ্যাস খনিজ সম্পদ ও বিন্যাসের উপর বহুজাতিক পুঁজির মালিকানা, দেশবিদেশি মুনাফাকেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্ব

শিক্ষা ও চিকিৎসাকে ক্রমে বাণিজ্য ও মুনাফার উপাদানে পরিণত করবার নীতি ও দর্শনের প্রভাব আরো অনেক বিষয়য় প্রবণতা তৈরি করেছে। বাণিজ্য, মুনাফা বা টাকার উন্মাদনা সমাজের সুবিধাভোগী অন্যান্য অংশের মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও ব্যাপক আকার ধারণ করেছে, টাকা কামানোর সর্বরকম তৎপরতা দিনে দিনে অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠছে। শিক্ষকদের বাণিজ্যিক প্রবণতা থেকে টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি, নিয়োগ বাণিজ্য, পরীক্ষার প্রশ্নফাঁস পর্যন্ত এটি বিস্তৃত।

বাণিজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয় টিকে আছে, কাজ করছে প্রধানত সর্বজন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক বিশেষজ্ঞদের দিয়েই। এছাড়া কোনো কোনো সর্বজন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিজেদের প্রাঙ্গণেই ভিন্ন শিফট করে বাণিজ্যিক তৎপরতায় নিয়োজিত হয়েছে। 'সার্টিফিকেট বিক্রির কারখানা' বাড়ছে। অর্থ মুনাফামুখী তৎপরতাই এখন প্রাধান্য। শিক্ষা এসবের শিকার, শিক্ষার্থীরা অসম্মানিত।

লেখক: অর্থনীতিবিদ